Vol. 39 | No. 3 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কেশবচন্দ্রের ধর্মসংস্কার : নবিবিধান প্রসঙ্গ

Volume	39
Issue	3
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো: মতিউর রহমান
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v39i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i3.4
Pages	127-150
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কেশবচন্দ্রের ধর্মসংস্কার : নববিধান প্রসঙ্গ

মো: মতিউর রহমান

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রাজা রামমোহন ছিলেন বাঙলার নবযুগের প্রবাদ -পুরুষ। তাঁর হাতেই বাঙালি নবজাগরণের দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেছিলো। তিনিই বাঙালি জাতির প্রাণদাতা, জাতির নতুন পথে এগিয়ে চলার মন্ত্রণাদাতা ও প্রেরণাদাতা। বাঙালির মধ্যে তিনিই প্রাতঃমনীষী, যিনি গণমানুষের মধ্যে সার্বভৌমিক ধর্মের আদর্শকে প্রচার করেন। তাঁর এ আদর্শকে আরও একধাপ এগিয়ে নেন তাঁরই সুযোগ্য মানসপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ছিলেন লোকোত্তর মহামানব। ভারতের শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে তিনি দীক্ষাগুরু রামমোহনের ভাবাদর্শকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহনে যা ছিলো অসমাপ্ত, দেবেন্দ্রনাথে তাই পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে। রামমোহনের দীক্ষামন্ত্র ও ভাবাদর্শের আলোকে তিনি বাঙালির অন্তরে জাগ্রত করলেন একটি নতুন ভাব, নতুন উন্মাদনা ও নতুন উদ্যম। আর এই রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের ক্রমধারায় তাঁদের যথার্থ উত্তর সাধক হিসাবে বাঙলার ঝটিকা তাড়িত আধ্যাত্মিক গগনে আবির্ভূত হন আচার্য কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪)। তিনি ছিলেন বাঙলার প্রাণপুরুষ, উনিশ শতকের বাঙলার দ্বিতীয়ার্ধের এক সফল যুগসারথি। জাতীয়তাবোধের বিজয়শঙ্খসুলভ সমাচার হাতে নিয়ে ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে তিনি বাঙালিকে দান করেছিলেন নতুন পরিচয়, মানুষকে সচেতন করেছিলেন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ও অবস্থা সম্পর্কে। তিনি ছিলেন সত্যানুরাগ ও ধর্মনিষ্ঠার এক যথার্থ বিগ্রহমূর্তি। তাঁর হাত দিয়েই বাঙলার নবযৌবনের ললাটে রাজ তিলক অঙ্কিত হয়েছিলো। তাঁর মধ্যেই রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনা চরম পরিণতি লাভ করে। বলা বাহুল্য, ধর্মসংস্কারের মাধ্যমেই আচার্য সেন তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার স্ফূরণ ঘটান। নববিধানের বিশেষ উল্লেখপূর্বক আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তাঁর ধর্মসংস্কার নিয়ে আলোচনা করবো। তবে তার আগে আচার্য সেনের ব্যক্তি পরিচয় ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু বলা প্রাসাঙ্গিক।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর কলিকাতাস্থ কলুটোলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক গবেষকদের মতে রাজা বল্লাল

সেন ছিলেন কেশবচন্দ্রের আদি পুরুষ।[১] কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর বাবা প্যারীমোহন সেন ও মা সারদা দেবীর দ্বিতীয় সন্তান। শৈশবকালে নিজগৃহে বসে গুরুর কাছে তাঁর পড়ালেখায় হাতে খড়ি হয়। অতঃপর ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সাত বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। তাঁর অগ্রজ নবীনচন্দ্র সেন তখন ওই কলেজের ছাত্র। শিশুকালেই তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। সেন পরিবারের অন্যান্য সন্তানের মতো তিনিও অতি শৈশবকাল থেকেই পাঠাভ্যাসে মনোযোগী ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন সুদর্শন, অমিয়কান্তি, মিষ্টালাপী ও মানবদরদী, তেমনি ছিলেন উচ্চমেধার অধিকারী। আর এ কারণে কিছুদিনের মধ্যেই কলেজের শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়তে আরম্ভ করলো। জুনিওর বিভাগের প্রতিটি শ্রেণীতে ভালো ফলাফলের জন্য তিনি পুরস্কৃত হতে থাকেন। হিন্দু কলেজের জুনিওর বিভাগের তৃতীয় শিক্ষক টি. স্টারজন ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : "The little boy with a big head"।[২] কেশবচন্দ্রের বয়স ছিলো তখন মাত্র বারো বৎসর। পড়াশোনার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। তিনি গভীর অভিনিবেশ ও একাগ্রতার সঙ্গে পাঠ্যানুশীলনে রত হতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : "Keshub prepared his lessons industriously, and added patient labour to natural genius. This habit of hard -work and systematic industry equally distinguished him at all times of life."[৩] কীর্তন, রূপকথা, যাত্রা তিনি শৈশবকাল থেকেই ভালোবাসতেন। কথিত আছে, অতি শৈশবকালে তিনি এসকল বিষয় শ্রবণ করে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, শিক্ষা ও জীবনধারা সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সহপাঠীদের নিয়ে রামযাত্রায় অভিনয়ও করেছিলেন। তিনি যে-কোন বিষয় হুবহু অনুকরণ করতে পারতেন।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র স্কুল বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এই সময় হিন্দু কলেজের সরকারীকরণ নিয়ে কলকাতায় এক অনাকাঙ্ক্ষিত মতবিরোধ ঘটায় প্রতিবাদকারী হিন্দু সমাজের নেতৃত্বে 'হিন্দু মেট্রোপলিটন' কলেজ নামে আর একটি কলেজ স্থাপিত হয়। কলুটোলার সেন পরিবারের অধ্যক্ষ হরিমোহন সেন এই নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পরিবারের অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনকেও হিন্দু কলেজ ছাড়িয়ে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি করে দেন। প্রভাতচন্দ্রের মতে, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই নব প্রতিষ্ঠিত কলেজে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়া হয় বলে তাদের পড়াশোনায় কিছুটা ব্যাঘাত ঘটতে দেখা যায়। হিন্দু কলেজে যে সকল বিষয় তিন বৎসর পর পড়তে হতো, নতুন কলেজে অন্যান্যদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রকেও এসকল বিষয় এ সময়েই পড়তে হলো। অসামান্য প্রতিভা বলে

তিনি এসকল কঠিন বিষয় আয়ত্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু গণিতশাস্ত্রে তিনি পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। যার ফলে একবৎসর পর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে আবার তিনি হিন্দু কলেজে ফিরে আসেন। তবে হিন্দু কলেজে তিনি আর পূর্বের মতো সফলতা দেখাতে পারেননি। বারবার কলেজ পরিবর্তনই এর কারণ। কলেজে অধ্যয়ন বিষয়ে তাঁর প্রসঙ্গে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : "Hence forth his educational career was not at all brilliant. He toiled at it with all his might: he was more than passable in English; he did tolerably well in History; he had a liking for Chemistry; and spent a lot of money in buying a set of apparatus; he did very well indeed in mental and moral philosophy, but he was at desperate odds in Trignometry and conic sections.[8]

ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন এবং রসায়ন শাস্ত্রে তিনি যথেষ্ঠ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন, কিন্তু ত্রিকোণমিতি ও কণিক শাখা, বিশেষত গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাঁর মন একেবারে বিরূপ হয়ে উঠলো। অঙ্কনের প্রতি তাঁর একটি স্বাভাবিক অনুরাগ ছিলো বটে, কিন্তু গণিত শাস্ত্রের খুঁটি-নাটি বিষয়ে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেনের অব্যাহত তিরষ্কারও তাঁকে গণিতশাস্ত্রে মনোযোগী করতে পারলো না। ইতোমধ্যে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র কলেজ শাখায় অধ্যয়ন করতে থাকেন।[৫] ১৮৫৬-৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র পাঠ্যবিষয়ের বহির্ভূত দর্শনশাস্ত্র নিয়ে গভীরভাবে অনুশীলন করেন। কেশবচন্দ্র প্রায়ই কলেজ লাইব্রেরিতে দীর্ঘ সময় ধরে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে। কলেজের দর্শন বিভাগের আচার্য রিচার্ড জনসনকেও তিনি পরম শ্রদ্ধা করতেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদরের মতে, "ওই সময়ে কেশবচন্দ্র প্রতিদিন কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরির মেটকাফ হলে সকাল এগারোটা হতে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত পাঠ্যানুশীলনে নিমগ্ন থাকতেন। ধর্ম ও দর্শন ছিলো তখন তাঁর একমাত্র অনুশীলনের বিষয়। দর্শনের ইতিহাস পাঠে তিনি গভীর আনন্দ উপভোগ করতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিল্টন, ইয়ং এবং শেক্সপীয়রের কবিতাও পাঠ করতেন। বলা বাহুল্য, শেক্সপীয়রের তিনি একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তবে তিনি উপন্যাস একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি আচার্য উইলিয়ম হ্যামিলটনের একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। ভিক্টর কুঁজোর গ্রন্থাদিও তিনি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। জে. ই. ভি. মোরেল, ম্যাকোস, থিয়েডোর পার্কার, মিস কুবের রচনাবলিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। এমার্সনের প্রতিও তিনি অনুরক্ত ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে কোনো কিছু জানার পূর্বেই তিনি এঁদের গ্রন্থ পাঠ করে ধর্মবিষয়ক প্রাথমিক তথ্যাদি লাভ করেন।[৬]

এভাবেই আচার্য কেশবচন্দ্র সেন পুথিগত বিদ্যার পরিবর্তে প্রকৃত বিদ্যার দ্বারা নিজেকে ভবিষ্যৎ জীবনের একজন স্থিতধী সংস্কারক রূপে তৈরি করে নিয়েছিলেন। আর এর ফলেই উত্তর জীবনে তিনি একজন সফল ধর্মসংস্কারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন কালেই ১৮ বৎসর বয়সে, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল চন্দ্রনাথ মজুমদারের বড় কন্যা জগমোহিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্ত্রীকে তিনি ভালোবাসতেন ঠিকই, কিন্তু সবকিছু বাদ দিয়ে স্ত্রী নিয়ে বসে থাকা পছন্দ করতেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জীবনবেদ-এ বলেছেন : "যাহাতে কষ্ট হয়, গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার দিকে মন না যায়, এমন সকল বিষয়েই নিযুক্ত হইতাম, এই সকল হইল কখন? আঠারো, উনিশ, কুড়ি বৎসরে। যখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলাম। সংসারের বাড়ী যেখানে করিব, দেখি, এই জায়গাই তো শ্মশান। সংসারের বিষয় বিশেষ বুঝিতাম না, কিন্তু সংসারের ভয় জানিতাম। স্ত্রী আসিতেছেন, সংসার আরম্ভ করিতে হইবে। 'সংসার বিলাসে তুমি সুখ করিবে? স্ত্রীর কাছে তুমি বসিয়া থাকিবে? সংসারের কথা লইয়া তুমি আলাপ করিবে? এসকল বিষয় তোমাকে সুখী করিবে?' ঠিক আমার মনের ভিতর এই সকল কথা যেন কে বলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, উচ্চ পদার্থ জীবাত্মা, একে আমি স্ত্রীর অধীন করিব? সংসারের অধীন করিব? প্রতিজ্ঞা করিলাম, এজীবনে স্ত্রৈণ হইব না; কেননা স্ত্রীর অধীন হইয়াই অনেককে মরিতে দেখিয়াছি ; সংসারের আঘাতে অনেক লোককে মরিতে দেখিয়াছি। তাই সংসারকে বলি—এ লোককে স্পর্শ করিও না।"[৭] এভাবেই কেশবচন্দ্র স্ত্রী ও নিজের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে নিজেকে উত্তরকালের একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কারক রূপে তৈরি করেছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেনের কর্মজীবন ছিলো বহুমুখী। ঐতিহাসিক মতে ১৮৫৯ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পঁচিশ বৎসরই ছিলো তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন। এই পঁচিশ বৎসরেই তিনি তাঁর সকল কর্মের বীজ বপন করে যান। অন্যদিকে এই পঁচিশ বৎসরই ছিলো উনিশ শতকের বাংলার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বভারতীয় নেতৃত্ব অবিসংবাদিত এবং কর্মপ্রয়াসও সুদূর প্রসারী। সুতরাং উনিশ শতকের বাঙলার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে কেশবচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা না করে উপায় নেই। তাই মনি বাগচি বলেন, 'প্লেটোকে জানা মানেই য়ুরোপকে জানা, য়ুরোপের মানসলোকের পরিচয় লইতে হইলে প্লেটোর সহিত সর্বাগ্রে পরিচিত হওয়া দরকার। তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা তথা ভারতের মানসলোকের পরিচয় লইতে হইলে কেশবচন্দ্রকে জানিতে হয়, তাঁহার জীবনদর্শনকে বুঝিতে হয়। বহু ভঙ্গীম চরিত্রের এই মানুষটি একাধারে ছিলেন ধর্মপ্রবক্তা, দার্শনিক লেখক, বক্তা,

সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষা প্রবর্তক, নীতিপ্রবক্তা, সমাজ সংস্কারক, স্বদেশ প্রেমিক, জনসেবক, আর সর্বোপরি ধর্ম সংস্কারক, ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মপ্রচারক ও ধর্মাচার্য। আজ দেশে ধর্ম, সমাজ, শিল্প, রাষ্ট্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে জনহিতকর যে সব প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি, বলিতে গেলে কেশবচন্দ্রই সে সমুদয়ের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। যে নবযুগ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়া সেই নবযুগের প্রায় সব কটি আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ... সর্বমানবীয় বিশ্বজনীন ধর্মের অনুশীলন দ্বারাই একদিন পৃথিবীর এই মানব সমাজ যে এক অখণ্ড মানব -পরিবারে পরিণত হইবে- কেশবচন্দ্রের অনুভূতিতে ইতিহাসের এই সত্যটি অতি পরিষ্কারভাবেই ধরা পড়িয়াছিল।[৮] এই হলেন আচার্য কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর কর্মবহুল জীবনের প্রতিটি পর্বে তিনি মানুষের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, মানুষকে নিয়ে ভেবেছেন, মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ কামনা করেছেন। মানুষের সুখ অনেকেই চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর মতো এতো নিখুঁত ও আন্তরিকভাবে মানবচরিত্র আর কেউ বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন কি-না সন্দেহ।

তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রবণতা ও বিচিত্র মনন প্রতিভার দিকে লক্ষ করেই চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছিলেন : "Keshub was an ardent nationalist, an ardent social reformer, an ardent man of god.[৯] কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন, এবং মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের সচিব নিযুক্ত হন। বয়স্ক শিক্ষা, নারীশিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তিনিই ব্রাহ্মসমাজকে একটি বৃহত্তর গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। সকল ধর্মমতের নির্যাস গ্রহণ ও সমন্বয় সাধনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন সংস্কৃতির ও সামাজিক ধারাকে মন্থন করে তিনি স্বসমাজ ও স্বদেশের উন্নয়নের চাকাকে ঘুরাতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব তাঁকে মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে। রামমোহনের মতো তাঁকেও আমরা সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করতে দেখি। কথিত আছে যে, খ্রীস্টান ক্যাথলিকদের মতো তাঁকেও কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ বা অনুশোচনা প্রকাশ করতে দেখা যায়। তার গতিশীল কর্মে সন্তুষ্ট হয়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ উপাধিতে ভূষিত করেন। কেশবচন্দ্রই ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম অব্রাহ্মণ আচার্য। কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও একাগ্র নিষ্ঠাই তাঁকে এ পদে আসীন করে। তাঁর মানবমুখী কর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পর্যটন করেন। কুসংস্কারপূর্ণ আচার, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা, উপবীত ধারণ, মদ্যপান, অবরোধ প্রথা, নিরক্ষরতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি ব্যাপক প্রচার চালান। তখনকার যুগে এ জাতীয় কর্ম বিপ্লবেরই নামান্তর ছিলো।

ভাগ্য বিধাতা বেশিদিন কেশবচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে থাকতে দেননি। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা জুলাই কেশবচন্দ্রসহ আরও কয়েকজন[১০] দেবেন্দ্রনাথকে একটি পত্রের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রস্তাব দেন। এক. যিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য, উপাচার্য বা অধ্যেতা নির্বাচিত হবেন তিনি ভুলেও সাম্প্রদায়িকতা বা জাতিভেদসূচক কোনো চিহ্ন ধারণ করবেন না। দুই. সাধু সচ্চরিত্র ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণরাই কেবল বেদির আসনে বসার অধিকারী হবেন। তিন. ব্যাখ্যান স্তোত্র ও উপদেশের মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্মের উদার প্রশস্ত ও নিরপেক্ষভাব প্রকাশ করতে হবে। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে অন্য সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করা চলবে না। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। চার. যতদিন উপাসনা সম্পর্কে নতুন কোনো প্রণালী গ্রহণ করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মদের ওই প্রণালী অনুসারে উপাসনা করার স্বাধীনতা দিতে হবে এবং পাঁচ. যদি এ-ও আপনার মনঃপূত না হয়, তাহলে আমরা যাতে আর একটি পৃথক ব্রাহ্মসমাজ তৈরি করতে পারি, সে ব্যাপারে সুপরামর্শ দেবেন।[১১] বলা বাহুল্য, এ ধরনের প্রস্তাবে দেবেন্দ্রনাথ যারপরনাই মর্মাহত হলেন। তাই তিনি ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই লেখা উত্তরে, নব্যব্রাহ্মদের নতুন ব্রাহ্মসমাজ তৈরি করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং আশীর্বাদ করলেন : "তোমরা পৃথক ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করিবে এবং তন্নিমিত্ত আমার নিকট সৎ পরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া, ইহাতে আমি উপদেশ দিতেছি যে, যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মা উন্নত হয়, যাহাতে ধর্ম্ম প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুতার সঞ্চার হয়, সেই সমাজের উপাসনা সময়ে এই প্রকারে বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও পাঠ ব্যবহৃত করিবে।"[১২]

অতঃপর ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' সংস্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতাদের ইচ্ছে ছিলো একে সমগ্র মানবতার সমাজরূপে পরিচালিত করা। তাই তাঁরা এর এমন একটি শ্লোক রচনা করেন যাতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সমগ্র মানবতা মিলিত হতে পারে। শ্লোকটির অর্থ: "জাতি নির্বিশেষে, ব্যক্তি নির্বেশেষে, দেশ নির্বিশেষে, সমুদয় নরনারীকে সমাজ সম্বন্ধে ও ধর্মবিষয়ে সমান অধিকার দিয়ে সকলকে এক ঈশ্বরের উপাসক করা এবং পবিত্র ভ্রাতৃভাবে সকলের সঙ্গে এক পরিবারে বদ্ধ হওয়া এর উদ্দেশ্য।"[১৩] এ প্রসঙ্গে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে কেশবচন্দ্র এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ স্মরণ করা যেতে পারে। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "বন্ধুগণ অতি গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের জন্য অদ্য আমরা

এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এই কর্ত্তব্যের জন্য আমরা নিজের নিকট এবং সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী। ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে একত্র করাই অদ্যকার প্রধান উদ্দেশ্য।"[১৪] প্রকৃতপক্ষে মননচর্চার স্বাধীনতা এবং ধর্ম ও সমাজসংস্কারের মহতী উদ্দেশ্য নিয়েই কেশবচন্দ্র সেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া একটি উপসনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। সকলের সঙ্গে ইহার বন্ধুতার সম্বন্ধ, শত্রুতার নহে। উন্নতি স্রোতেই ইহা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এবং ব্রাহ্ম উপাসকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার জন্য এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজও ইহার অন্তর্গত।"[১৫]

কিন্তু এখানেও মতবিরোধ দেখা দিল। যে আদর্শিক অন্তর্কলহের কারণে কেশবচন্দ্রকে এক সময় দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্ম সমাজ থেকে বের হয়ে আসতে হয়েছিলা, ঠিক একই দ্বন্দ্বের কারণে কেশবচন্দ্রের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকেও কিছু লোক বেরিয়ে গিয়ে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে নতুন আর একটি সমাজ তৈরি করেন। ব্রাহ্মসমাজের এই পুনঃ পুনঃ বিভক্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "তিনি (কেশবচন্দ্র)ও তাঁর অনুগামীরা দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্ম সমাজ থেকে পৃথক হয়ে যান। কারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগ, অসবর্ণ বিবাহ, ও খ্রিস্টের প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শনে আপত্তি তোলেন, ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ। 'সমদর্শী' নামে এই গোষ্ঠীর একদল পরে আবার বেরিয়ে গিয়ে অন্যান্য ব্রাহ্মদের পক্ষে একত্রে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮) করেন। তাঁরা কেশবপন্থীদের গুরুবাদ পছন্দ করতেন না। ব্রাহ্ম আন্দোলনকে একটি গণতান্ত্রিক রূপ দেয়াই ছিল তাদের লক্ষ। এই বিভেদের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নিজেরই সৃষ্ট বিবাহ আইন ভঙ্গ করে কেশবচন্দ্র নিজের অপরিণীতা কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের রাজকুমারের বিবাহ দেন এবং সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক আচারণানুষ্ঠান পালিত হয়।[১৬] এই সব কারণে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গোষ্ঠী কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেন। বিবাহের ব্যাপারটা ছিলো মূলত রাজনৈতিক। স্বাধীন করদ রাজ্য কুচবিহারের প্রশাসনকে আধুনিকীকরণের জন্যে ইংরেজ শাসকরা এই বিবাহের প্রস্তাব করে। দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু রাজভক্ত কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্মের প্রসারকল্পে সম্ভবত বিবাহ দানে সম্মত হন। এই বিবাহকে উপলক্ষ করে কেশবচন্দ্রের বিরোধীরা যে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন, ব্রাহ্মধর্মের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে তাতে ভাঙ্গন ধরা দেয়।"[১৭] এই ভাঙ্গনের পর থেকেই কেশবচন্দ্রের ভাতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ধীরে ধীরে 'নববিধান' নামটি গ্রহণ করতে থাকে। অতঃপর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি থেকে এই সমাজ 'নববিধান' নামটি ধারণ করে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কেশবচন্দ্রের কর্মজীবন ছিলো মূলত পঁচিশ বৎসর, ১৮৫৯-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পঁচিশ বছরেই তিনি বহুবিধ কর্মের স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হন। তিনি আগাগোড়াই ছিলেন একজন সার্থক মানবতাবাদী দার্শনিক ও জীবনবাদী সংস্কারক। তাঁর মানবতাবাদী ও জীবনমুখী কর্মের মধ্যে সকল জাতি ও ধর্মের লোকদের দিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান রিফর্মস এসোসিয়েশনস', পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে একত্রে বসবাস ও মিলিত উপার্জনে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত আশ্রম', দেশব্যাপী প্রচারের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠিত 'প্রচারক সভা' এবং শিক্ষাবিস্তার ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য কলকাতায় 'আলবার্ট হল' ও 'আলবার্ট ইনস্টিটিউট' উল্লেখযোগ্য। তিনি যে ভারতবর্ষীয় মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেটি তাঁর হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টধর্মের সমন্বয় প্রচেষ্টার এক মূর্ত বিগ্রহ। মাতৃভাষায় ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন ও বেদ, বাইবেল, কুরআন, জেন্দ আবেস্তাসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে আদর্শ সূত্র চয়ন করে তিনি 'শ্লোক সংগ্রহ' নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম মন্দির নির্মিত হয়। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে শীঘ্রই ব্রাহ্ম সমাজ একটি জনতার আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। এ প্রসঙ্গে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'উচ্চ আদর্শ ও শুভ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত কেশবচন্দ্র বাঙলার সামাজিক ও নৈতিক সমাজে নতুন ধারায় উন্নীত করার প্রয়াসী হন। বহুমুখী সমাজসংস্কার কর্মে নারী প্রগতিকে তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। জীবনের শেষ পাঁচটি বছর তিনি সমন্বয় ধর্ম প্রচার, গ্রন্থ রচনা ও সংস্কার কর্মে অতিবাহিত করেন। নতুন ধর্মাদর্শ প্রচারের সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা এবং সাধকদের জীবন চরিত রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতোমধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী 'জীবনবেদ' ও 'নবসংহিতা' গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধকদের নিয়ে সার্বভৌম সাধকমণ্ডলীর পত্তন, নারীসমাজ গঠন ও রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে লোকশিক্ষা প্রচারই তাঁর এই সময়ের প্রধান কাজ ছিল।"[১৮] এভাবেই তাঁর জীবন ও মননে একদিকে ভক্তিবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদ এবং অন্যদিকে সমাজ সংস্কার ও মুক্তি প্রেরণা যুগপৎ ক্রিয়াশীল থাকে।'

কেশবচন্দ্রের শিক্ষা ও কর্মজীবন নিয়ে এতক্ষণ সাধারণভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবার তাঁর প্রধান কর্ম— নববিধানের বিশেষ উল্লেখপূর্বক ধর্মসংস্কার নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই। তাঁর জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, একটি মহৎ ও সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিলো তাঁর প্রধান স্বপ্ন। তাই দেখি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ থেকে যখন কিছু ব্রাহ্মী বেরিয়ে গিয়ে নতুন আর একটি সমাজ গঠন করেন তখনও তিনি থেমে থাকেননি বা এই ভাঙ্গনে নিরাশ হয়ে পড়েননি। বরং আরও নতুন উদ্যমে তিনি তাঁর সমাজকে গতিশীল করে তোলার চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে তখন থেকেই তিনি তাঁর সমাজকে 'নববিধান' নামে আখ্যাত করতে থাকেন। আর এই নববিধানেই নিহিত রয়েছে তাঁর ধর্মসাধনার সারৎসার। অর্থাৎ এই নববিধানই হচ্ছে তাঁর ধর্ম সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। এর মাধ্যমেই তিনি সমন্বয়বাদী ধর্ম প্রচার করেন। নববিধানের নতুন বাণী শিক্ষিত সাধারণের গোচরীভূত করার জন্য তিনি প্রকাশ করেন 'দি নিউ ডিসপেনসনস'। ভারতের সর্বত্র নববিধানের বাণী ও নির্যাসকে পৌঁছে দেয়ার জন্য নববিধানের বক্তব্যকে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত, সিন্ধী, মারাঠী, উড়িয়া, তামিল ও তেলেগু ভাষায় অনুদিত করে বিতরণ করা হয়।[১৯]

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, নববিধান ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর। তবে নববিধানের সার্বভৌমিক আবেদনের মাধ্যমে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্মকে এক উদার আধ্যাত্মিক ও সর্বজনীন ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে নববিধানের লক্ষ্য ছিলো উদার ও সার্বভৌম দৃষ্টি সৃষ্টি করা। এ প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র নিজে বলেন: "ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম এতদিন কেবল হিন্দুস্থানের ব্রাহ্ম ছিলেন— এখন তিনি সমগ্র জগতের ব্রাহ্ম হইলেন।... এতদিন গগণে উড়িতেছিল কেবল হিন্দু ধর্মের নিশান, হিন্দু ধর্মের নিশানের পরিবর্তে এখন গগণে সার্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। হিন্দুস্থানের ব্রাহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রাহ্ম হইলেন। বেদান্তের সঙ্গে বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরআন, লালিতাবিস্তর প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রে মিলিত হইল।"[২০] এভাবে তিনি যেন ব্রাহ্ম ধর্মকে হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দিলেন, নিজের নিয়ত পরিবর্তনশীল সাধনার পথে— বিধান ও নববিধানের পথে ব্রাহ্ম সমাজকে চালিত করার প্রয়াসী হলেন। তাই তিনি অন্যত্র বলেন : "এই দেখিয়াই নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম নব ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে। অন্যে আংশিকভাবে রাখিতে পারেন, নববিধানে তাহা কখনই হইতে পারে না। আমার জীবনে যত দেখিয়াছি, এক একটি লইলে অপরাধ, তখন এই নতুন নামে ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপস্থিত করা আবশ্যক।"[২১] কেশবচন্দ্র তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনে পৃথিবীর সকল ধর্মাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। দৈনন্দিন আচার আচরণে তিনি জগতের বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক যেমন গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রিস্ট, হযরত মুহম্মদ (দঃ), শ্রী চৈতন্যদের প্রমুখ মহাজ্ঞানীদের সাধন ভজনে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন; আর এই পথেই তাঁর আবিষ্কৃত নতুন সত্যকে তিনি নিজেই নববিধান নামে আখ্যাত করেন। নববিধানকে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বিবর্তিত রূপ বলেই অভিহিত করেছিলেন। এ যেন এক প্রাণজাত শিশু, যে প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ মাতৃজঠরে সংগোপনে

বিকশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : "পৃথিবী শোন, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্ম সমাজের গর্ভে ধর্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের প্রসবযন্ত্রণার পর আজ সেই শিশু জন্মধারণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদয় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই শিশুর মধ্যে বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-তন্ত্র-বাইবেল কুরান সমুদয় রহিয়াছে।"[২২] তাই কেশবচন্দ্রের ধর্ম সমীক্ষায় নববিধানের গুরুত্ব অপরিসীম।

নববিধানের নিহিতার্থকে আরও সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবার আমরা তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করবো। এক. ঈশ্বরকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে নববিধানের প্রথম বৈশিষ্ট্য। এখানে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের এক নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে কেশবচন্দ্র তাঁর নববিধানে ঈশ্বরকে স্বগুণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর যেহেতু স্বগুণ সে কারণে তিনি প্রাণ হয়ে সর্বভূতে বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। বজ্রে ঈশ্বর সূর্যে ঈশ্বর, অনলে ঈশ্বর, অন্নে ঈশ্বর, বস্ত্রে ঈশ্বর এককথায় জগতের সর্বত্রই তাঁর অধিষ্ঠান। তবে উল্লেখ্য যে, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরকে স্বগুণ বলে উল্লেখ করলেও স্বামী রামানুজের মতো তাঁর ঈশ্বর কিন্তু আকারবিশিষ্ট নন। ঈশ্বর নিরাকার ও অন্তহীন। অনন্ত ভাব, অনন্ত দয়া, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হবে। এভাবেই কেশবচন্দ্রের নববিধানে ঈশ্বর স্বগুণ হয়েও নিরাকার, সাকার হয়েও স্বগুণ।

দুই. নববিধানে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের তিনটি রূপ স্বীকার করেছেন। এই তিন প্রকারে ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেন তাঁর ত্রিত্ব প্রত্যয়ে বিন্যস্ত—পিতাভাবে, পুত্রভাবে এবং পবিত্রাত্মার ভাবে।[২৩] পরমেশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা, তাবৎ সৃষ্টির তিনি পিতা। এই হলো পিতারূপে তাঁর প্রকাশ। কিন্তু পিতা শব্দটি একটি আপেক্ষিক শব্দ—পুত্র না থাকলে পিতা হওয়া যায় না। পিতা যেমন সন্তানদের প্রতিপালন করেন, তেমনি সন্তানেরও পিতার প্রতি কিছুটা কর্তব্য থাকে। ধর্ম সাধন ও ব্রত আচরণ, ইত্যাদির মাধ্যমে সেই কর্তব্য পালন করতে হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ কর্তব্য জ্ঞানে অনেক সময় বিস্মৃত হয়ে যায় বলে ঈশ্বরকে পুত্ররূপেও ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হতে হয়। যেমন যীশুখ্রিষ্ট। পুত্রভাবে ঈশ্বর ক্ষমা নির্ভয় ও প্রেমের বিগ্রহ সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হন। এই হলো পুত্রভাবে তাঁর প্রকাশ। তৃতীয় ভাবের নাম পবিত্রাত্মার প্রকাশ। এভাবকে প্রত্যাদেশ বলা হয়ে থাকে। নববিধানের মতে পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, তাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে ও সত্য প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্বে এই ত্রয়ী লীলাতেই ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির কাছে প্রকটিত হচ্ছেন। আত্মসমর্পিত ও পবিত্রাত্মার অধিকারী ব্যক্তির সরল অন্তরে প্রত্যাদেশ রূপে ঈশ্বরের এই প্রকাশভাব উপলব্ধ নয়।

তিন. নববিধানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য মূর্তিপূজা ও অবতারবাদকে অস্বীকার করা। নববিধানের মতে ঈশ্বর যেহেতু অনন্ত আকার বিশিষ্ট সত্তা, সেকারণে মানব দেহে তাঁর প্রকাশ সম্ভব নয়। তবে পুত্রভাবে তিনি বহুবার মহাপুরুষদের প্রেরণ করেছেন। পরমেশ্বরের এক একটি ভাব মহাপুরুষের প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়ে পুত্রভাবে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। তাই গীতায় বলা হয়েছে : "যখনই যে দেশে ধর্ম গ্লানিময় হয়ে উঠে, তখনই ধর্মকে তার পূর্বাসনে বসিয়ে দুষ্টদের দমন আর শিষ্টদের পালনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।"[২৪] কিন্তু পরমেশ্বরের এই ভাবকে কেশবচন্দ্র অবতারবাদ বলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে এ হচ্ছে পরমেশ্বরের পুত্রভাবে আগমন। কেশবচন্দ্রের ধারণা, এভাবেই রোম ও গ্রিসকে পাপের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশা, আরবদেশের পৌত্তলিকতা দূর করার জন্য মুহম্মদ (দঃ) এবং ভারতবর্ষকে বাহ্যিক ধর্মাচরণ থেকে রক্ষা করার জন্য শাক্যমুনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

চার. সর্বধর্মের সমন্বয় নববিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ঝরা বসু নববিধানের এই সমন্বয়বাদী বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : "নববিধানে সর্বশাস্ত্রের, সফল সাধুগণের, সকল সাধু কার্যের মিলন ঘটেছে। নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্মকে আপনার ভিতর বিলীন করেছে। নববিধানে জ্ঞান ও ভক্তি, যোগ ও কর্মের সামঞ্জস্য ঘটেছে। নববিধানে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের, যুক্তির সঙ্গে ভক্তির, প্রথার সঙ্গে প্রগতির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান সকল প্রকার বিজ্ঞান এই ধর্মের অন্তর্গত। আমাদের বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, এবং পৃথিবীর সাগর, পর্বত সকলের সঙ্গে ঈশ্বরের নামে সংযুক্ত ও সকল বস্তুর মধ্যে সার্বভৌমিক ধর্ম উপলব্ধি করে এই ধর্ম। নববিধানের মধ্যে আছে স্পষ্ট একটি সামঞ্জস্যের ভাব।"[২৫] প্রকৃত প্রস্তাবে সকল কর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও একনিষ্ঠ সমরূপ মনোভাবই কেশবচন্দ্রের ধর্মজিজ্ঞাসাকে তাড়িত করেছে বারবার। এই সকল ধর্মের নির্যাসকে তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নববিধানে। নববিধানের এই সমন্বয়ধর্মী মনোভাবকে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : "১. জীব ও জগতের নিয়ামক পরমসত্তা সর্বদাই ক্রিয়াশীল। ২. ঐশী নির্দেশ গ্রহণে উপযোগী মানুষের কাছে ঈশ্বরাদেশ প্রেরিত হয়। ৩. মনুষ্য জীবনের সহিত জড়িত যাবতীয় নৈসর্গিক বিষয় ঐশী নির্দেশে তাৎপর্যবহ। প্রার্থনার ফলে সেই নির্দেশ মনুষ্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় এবং তা যদি পরীক্ষামূলক হয় তাহলে পরীক্ষার সম্মুখীন হবার শক্তিও মানুষ প্রাপ্ত হয়।"[২৬] তাঁর মতে, নববিধান সকল ধর্মবিধানকে পূর্ণ করতে এসেছে। তাই তিনি বলেন : "কোথায় ইহুদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় খ্রীষ্ট বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ বিধান,

কোথায় মুসলমান বিধান, সমুদয়ের সঙ্গে ইনি সমৃদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসে নাই।"[২৭] তাঁর মতে নববিধান এসেছে গড়তে, অপূর্ণকে পূর্ণ করতে; তাই নববিধান যথার্থ অর্থেই সামঞ্জস্যশীল।

পাঁচ. নববিধানের অপর বৈশিষ্ট্য তার জীবনবাদিতা। নববিধান কেবল একখানা শ্লোক সর্বস্ব গ্রন্থ নয়। এটি জীবনের ধর্মবিশেষ, জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করার বিধান রয়েছে নববিধানে। জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচা নয়, বরং নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতকে জয় করে জীবনকে অর্থবহ করে তোলাই নববিধানের পরম লক্ষ্য। তাই নববিধান একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি বিভিন্ন ভাবের সমাহার, বিভিন্ন আদর্শের সমষ্টি। কেশবচন্দ্রের মতে কোনো মানুষই কেবল ভক্তি, কেবল জ্ঞান কিংবা কেবল কর্ম বা কেবল যোগ নিয়ে তার সকল বৃত্তির স্ফুরণ ঘটাতে পারে না। পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য চাই নানা ধরনের ভাব ও আদর্শের অনুশীলন। নববিধান সে লক্ষ্যেই নিয়োজিত। সেকারণেই বিনয়েন্দ্রনাথ সেন বলেন : "নববিধান Electicism নহে। কিন্তু ইহা একটি নূতন জীবন্ত শক্তি, এক সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনব আদর্শ যাহা জগতের যাবতীয় আদর্শকে রূপান্তরিত করিয়া, আপনার মধ্যে সকলের জীবনীরস সংগ্রহ করিয়া নবজীবনে নূতন কিছু হইয়া জগতে দর্শন দিয়াছেন।"[২৮] এই নববিধানের আদর্শই মানুষকে যোগের ঈশ্বর, ভক্তির ঈশ্বর কর্মের ঈশ্বর— সবই যে এক ও অভিন্ন সত্তা তা উপলব্ধি করাতে পারে। তাই নববিধান অন্তর্মুখীনতাকে সমর্থন করেনি। আর করেনি বলেই সে ধর্মকে জীবনের এক সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। বিবিধের মধ্যে মিলনই এখানে বড় কথা। কেশবচন্দ্রের ভাষায় : "নববিধান পৃথিবীতে আসিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন- কোন বিশেষ পুস্তকের আধিপত্য থাকিবে না, বাইবেল, কুরান, বেদ, পুরাণ সকলের উপরে ভক্ত জীবনরূপ ধর্মপুস্তক সমাদৃত হইবে। উহা পৃথিবীকে হরি প্রেমলীলা জীবন্ত আকারে প্রদর্শন করিয়া ধর্মশিক্ষা দিবে।[২৯]

ছয়. সর্বজনীনতা নববিধানের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। এটি একাধারে জাতীয় ও সর্বজনীন। নববিধান ভারতবর্ষে জাত হলেও সমগ্রবিশ্বের সঙ্গে এর নাড়ীর সম্বন্ধ বিদ্যমান। যেজাতির কাছে যা সত্য আছে, যে ধর্মে যা আদর্শ আছে তা সবই গ্রহণ করেছে নববিধান। আর এজন্যই নববিধানে জাতি ধর্ম, বর্ণ, দেশ নির্বিশেষে সবার অংশীদারীত্ব রয়েছে। মুসা, সক্রেটিস, ঈশা, মুহম্মদ বিদেশী হয়েও শাক্যমুনি, চৈতন্যদেবের মতো নববিধানে গভীর শ্রদ্ধার পাত্ররূপে পূজিত। এ প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন বলেন, "বিদেশীর মুসা আমাদিগকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন, বিদেশীর ঈশা সৎপুত্র হইয়া স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা পালন করিবার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, দূরদেশীয় মুহম্মদ একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিতেছেন। অপরাপর বিদেশীয় মহাপুরুষেরা স্বর্গের বিচিত্র সৌন্দর্য দেখাইতেছেন।"[৩০] তাই নববিধান

সর্বজনীন। আবার নববিধান সর্বজনীন হয়েও হিন্দুজাতির অন্তর্গত। কেশবচন্দ্রের ভাষায় : "কিন্তু এই বৃক্ষের রস হিন্দু, এই বিধানের দক্ষিণ হস্তে ইংরেজী বিদ্যা ও সততা, বামহস্তে মুসলিম তেজ, কিন্তু ইহার রক্তে হিন্দুর ভোগভক্তি, হিন্দুর কোমল প্রীতি। যিনি নববিধানের ব্রাহ্ম, তিনিই প্রকৃত হিন্দু।"[৩১] একারণেই কেশবচন্দ্রের নববিধান জাতীয় হয়েও সর্বজনীন, আর সর্বজনীন হয়েও জাতীয়।

সাত. ঈশ্বরকে পিতৃভাবে সাধনা করার পরিবর্তে মাতৃভাবে সাধনা করা নববিধানের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধনা করা নতুন কোনো ব্যাপার নয়। খ্রিস্টজগৎ বা অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বরকে পিতৃভাবে সাধনা করলেও ভারতীয় ধর্মসাধনায় কিন্তু ঈশ্বরকে মাতৃজ্ঞানেই ভজনা করা হয়ে থাকে। কেশবচন্দ্রও তাঁর নববিধানে ঈশ্বরকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি আচার্যের উপদেশ প্রদানকালে কেশবচন্দ্র যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "একবার কেবল বিশ্বাসী হইয়া, হে ব্রহ্ম, হে জননী বলিয়া হরিকে ডাকো। কিন্তু এখন যেভাবে আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, সেইভাব সম্পূর্ণরূপে নূতন। আমাদিগের বিশেষ বিশেষ অভাব অনুসারে ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ হইতে সময়ে সময়ে এক একটি নূতন ভাব প্রেরণ করেন। এক একটি সময় তাঁহার এক একটি নাম বিশেষ ভাবের সহিত আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর দেখিলেন, এখন ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ অবস্থা হইতেছে, তাহারা কেবল তাঁহাকে দয়াময় গুণনিধি বলিলে তাহাদিগের পরিত্রাণ হইবে না। এইজন্য তিনি আমাদের নিকট তাঁহার মিষ্টতর 'মা' নাম প্রেরণ করিলেন। তাঁহার যে নামের মোহিনী শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, তিনি নিজ স্নেহগুণে সন্তানদিগের কল্যাণের জন্য, আমাদের নিকট সেই নাম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সন্তানের নিকট মা যেমন, আমাদিগের সম্পর্কে তিনি সেইরূপ।"[৩২]

আট. নববিধানের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম বা নৈতিকতার উৎসরূপে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা 'সজ্ঞার প্রাধান্য স্বীকার করা। কেশবচন্দ্রের মতে মানুষের ধর্ম ও নীতিবোধের উৎস দু' রকম — ধর্ম বা অনুশাসন এবং মানুষের সহজাত আন্তরপ্রবণতা বা 'স্বজ্ঞা। কেশবচন্দ্র দ্বিতীয় ধারার সমর্থক ছিলেন। জীবনবেদ-এ তাই তিনি বলেন, "যখন কেহ সমর্থন করে নাই, যখন কোন ধর্ম্মসমাজে সত্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে 'প্রার্থনা করা, প্রার্থনা কর' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। ধর্ম্ম কি জানিনা, ও ধর্ম্মসমাজ কোথায় কেহ দেখায় নাই; গুরু কে কেহ বলিয়া দেয় নাই; সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই— জীবনের সেই সময়ে

আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা করা, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই' এই শব্দ উচ্চারিত হইত।... গীর্জায় যাইব কি মসজিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব কি বৌদ্ধদিগের দলে যোগ দিব, তাহার কিছুই ভাবিতাম না।"[৩৩] প্রথমেই বেদ, বেদান্ত, কুরন, পুরাণ, অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম। কেশবচন্দ্রের এই উক্তি থেকেই অন্তর্লোকের উপর তাঁর প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। যাকে আমরা বিবেক বা অন্য কথায় স্বজ্ঞা বলে থাকি, কেশবচন্দ্রের মতে এটিই ছিলো ধর্মীয় জ্ঞান বা নীতিজ্ঞান অর্জনের এক নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।[৩৪]

নয়. বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে মিলিয়ে দেখা নববিধানের অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নববিধান একটি সমন্বয়বাদী জীবনদর্শন। এখানে যেমন যোগের সঙ্গে ভক্তি ও কর্মের, কর্মের সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির, ধর্মের সঙ্গে বৈরাগ্য , শান্তির সঙ্গে উদ্যমের, বিনয়ের সঙ্গে মহত্ত্বের, প্রেমের সঙ্গে পুণ্যের, দেশীভাবের সঙ্গে বিদেশী সত্যতার, অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, তেমনি আপাতবিসদৃশ বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যেও এক অনুপম সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কেশবচন্দ্র নিজেই ছিলেন, সমন্বয়ের এক মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ। সবকিছুর মধ্যেই তিনি সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেন, "ঈশ্বর বলিয়াছেন, বিজ্ঞান আমাদিগের ধর্ম্ম হইবে। তোমরা সকলের উপর বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে। বেদাপেক্ষা জড়বিজ্ঞানকে, বাইবেলাপেক্ষা অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে সম্মান করিবে। জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ব, শরীরবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি ঈশ্বরের জীবন্ত শাস্ত্র। দর্শন, ন্যায় ও নীতিবিজ্ঞান, যোগ দেবনিশ্বাসিত এবং প্রার্থনা আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের শাস্ত্র। নূতন ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রতি বিষয় বৈজ্ঞানিক, কিছুই অবৈজ্ঞানিক নয়। নিগূঢ় রহস্য দ্বারা তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিও না, স্বপ্ন বা কল্পনার প্রশ্রয় দিও না। কিন্তু পরিস্কৃত দৃষ্টিতে এবং প্রশস্ত বিচারে সকল বিষয় প্রমাণিত কর।"[৩৫]

দশ. মানবতাবাদী, গণমানুষের কল্যাণকামী জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠা নববিধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কেশবচন্দ্রের লক্ষ্য ছিলো নববিধানের মাধ্যমে জাগতিক সৌহার্দ্য, সর্বাত্মক ও সমবায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে এক সারিতে দাঁড় করানো। মানুষে মানুষে কোনো বিভেদ, কোন দ্বন্দ্ব, কোনো অস্পৃশ্যতা থাকবে না। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হওয়ার পরও যদি মানুষ পরস্পরকে ঘৃণা করে, তাহলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব থাকে কিভাবে? তাই তিনি চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে মানুষকে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করতে। তাঁর মতে এধরনের মৈত্রী বন্ধনেই

মানুষের মনুষ্যত্বের সার্থকতা নিহিত। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেন, "গোঁড়ামি, ধর্ম্মান্ধতা, নববিধানের ভাবের একান্ত বিরোধী জানিয়া উহাদিগকে নিয়ত পরিহার করিবে। তোমাদের বিশ্বাস অসর্ব্বান্তভাবক না হইয়া সর্ব্বান্তভাবক হউক। তোমাদের প্রেম সাম্প্রদায়িক অনুরাগ না হইয়া সার্ব্বভৌমিক ঔদার্য হউক। যদি তোমরা কেবল আপনাদের লোক, আপনাদের জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনকে ভালবাস ইহাতে তোমাদের আর কি গৌরব? তোমরা নতুন সম্প্রদায় গড়িবে না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে। তোমরা নতুন ধর্ম্মমত সংসৃষ্ট করিবে না, কিন্তু সকল ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিবে।[৩৬] এভাবেই কেশবচন্দ্র তাঁর নববিধানে মানুষের জয়গান কীর্তন করেন।

এতক্ষণ আমরা উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্যের আলোকে নববিধানের স্বরূপ, তাৎপর্য ও নিহিতার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। নববিধান কেশবচন্দ্রের ধর্মসমীক্ষার এক পরিণত ও সার্থক রূপায়ণ। তাই তার ধর্মজিজ্ঞাসায় নববিধান এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। পূর্ণতা, সাম্য, ঐক্য ও মানবতার অদম্য আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ ঘটেছে নববিধানে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজই ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে নববিধান নামে পরিচিত হয়ে আসছে। কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধনার সুদীর্ঘ ইতিহিাসকে তিনি রূপায়িত করেছেন নববিধানে। নিয়ত পরিবর্তনশীল সাধন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নতুন নতুন বিধান দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ঐতিহাসিক নববিধান এবং সাধনার এক সুবিশাল ইতিহাস। এর সৃষ্টিতে প্রার্থনাই তাঁর প্রথম অবলম্বন। প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর ধর্মজীবন শুরু করেন। এই প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তিনি লাভ করেছিলেন ধর্মকে। প্রার্থনার মাধ্যমেই লাভ করেছিলেন অন্তহীন ধর্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর।[৩৭] এ প্রসঙ্গে ঝরা বসু মন্তব্য করেন :

> "যখন হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান কোন ধর্মই তাঁকে আকৃষ্ট করেনি, তখন এই প্রার্থনা— বেদ, বেদান্ত, কোরান, পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা তাকেই তিনি অবলম্বন করলেন।" তার ধর্মজীবনের দ্বিতীয় স্তরে পাপবোধের প্রকাশ।

পাপের ভারে গুরুভারাক্রান্ত হৃদয় সহজেই ঈশ্বরমুখী হয়ে পড়ে। পাপবোধ তাঁকে বৈরাগ্যের দীক্ষা দিয়েছে। অন্তরে বিবেকের অগ্নি জ্বালিয়ে বৈরাগ্যের বিষাদ নিয়ে তিনি অগ্নিমন্ত্রে স্নাত হলেন। রামমোহনের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন যুক্তি ও স্বাধীনচিন্তা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে থেকে পেলেন আন্তরিকতা ও

সংসারানাসক্তি।"৩৮ এভাবেই তিনি নববিধানকে দাঁড় করালেন জীবনের বিধান বা জীবনদর্শনরূপে।

১৮৫৯ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পঁচিশ বৎসর কেশবচন্দ্রের কর্মজীবন হলেও ধর্মসাধনায় তিনি ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট চার বছরই ব্যয় করেন। এ সময়ে তাঁর প্রধান কাজই ছিলো ধর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্ম সমাজের পুনর্গঠন। ব্রাহ্ম সমাজের পুনর্গঠনের পাশাপাশি তিনি জাতির সেবা, জাতি ও সমাজের উন্নয়নে বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যান। এভাবেই তিনি মুক্তি ও ভক্তির, কর্ম ও জ্ঞানের এবং বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে এ ব্রাহ্ম সমাজকে এক পবিত্র ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল প্রদান করেন। তিনিই ব্রাহ্ম ধর্মকে Relgion of theory-র পরিবর্তে Religlon of life-এ পরিণত করেন। এ প্রসঙ্গে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন, "ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে যে শক্তি ঘুমাইয়াছিল, বীজের মধ্যে যেমন একটা প্রকাণ্ড গাছের প্রাণ লুকাইয়া থাকে, কেশব তাহাকে জাগাইয়া কাজের ক্ষেত্রে বাহির করিয়া, আমাদের এই নূতন যুগের ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন করিয়া দিলেন। ... আমার মনে হয় কেশব যদি কর্মক্ষেত্রে না নামিতেন, তবে কত বৎসর ধরিয়া এই যুগের ব্রাহ্মসমাজ একটা কলেজের ফিলোসফি সেমিনারী মাত্র হইয়া কলিকাতায় একটি ধনী দলের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আর দু তিনখানি পুস্তিকা এবং একখানি ছোট মাসিক পত্রিকা বিতরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইত।"৩৯

এ পর্যায়ে কেশবচন্দ্রের ধর্মবিষয়ক মতে প্রতীচ্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ঐতিহাসিকদের মতে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতো ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মবিষয়ক চিন্তাধারায়ও আমরা খ্রিস্টধর্মের প্রভাব লক্ষ করি। নবযুগের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় খ্রিস্টধর্মের একেশ্বরবাদ ও নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন; মহর্ষির ব্রহ্মসঙ্গীতে এ প্রভাব আরও প্রকটিত। কেশবচন্দ্র আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খ্রিস্টীয় নীতিমালাকে আপন করে নেন। তাঁর প্রবর্তিত নববিধান মন্দিরের রীতিনীতিতে খ্রিস্টীয় আচারানুষ্ঠানের একছত্র প্রভাব লক্ষণীয়। তাছাড়া, আচার্য অভিষেক, ধর্মে দীক্ষা দান, অন্তিম ভোজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও তিনি খ্রিস্টীয় রীতি অনুসরণ করেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর সরমন সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও তিনি ঔপনিষদীয় সর্বেশ্বরবাদী আত্মবিকাশ, আত্মোন্নয়ন ও আত্মস্ফূরণের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু কেবশচন্দ্র খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শেই অন্তত জীবনের প্রথম দিকে চালিত হন। পূর্বসূরী রামমোহনের যুক্তিবাদি দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে ভক্তিবাদী আদর্শ দ্বারাই তিনি বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন; আর একারণেই তাঁর প্রথম জীবনের আচার ও আচরণে, চিন্তায় ও আদর্শে, কর্ম ও মননে অতীতের খ্রিস্টীয় প্রভাব ছিলো অধিক মাত্রায় কার্যকর। অবশ্য জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবে খ্রিস্টীয় প্রভাববলয় থেকে নিজেকে বেশ কিছুটা মুক্ত করেছিলেন। এ সময় তিনি আন্তলৌকিক যোগসাধনায় বেশি আকৃষ্ট থাকেন। জীবনের এই শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহায়তায় নববিধান সভার বৈষ্ণবদের মতো সংকীর্তনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। আধুনিক গবেষকদের মতে, কেশবচন্দ্রের চিন্তাচেতনায় প্রতীচ্যের কার্লাইল এবং ইমার্সন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কেবশচন্দ্র ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতায় আস্থাশীল ছিলেন। তিনি ঈশ্বরকেই জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে প্রকৃতির মধ্য দিয়েই ঈশ্বর প্রকাশিত হন; ঈশ্বর জগতের জীব ও জড়ের সকল কিছুর স্থলে অধিষ্ঠিত। ঈশ্বর ব্যতীত জড় বা জীব কারও অস্তিত্বই সম্ভব নয়। জগতের সর্বত্র আমরা যে সুসামঞ্জস্য সম্পর্ক ও শুভগতি ও মানবাত্মার সর্বাঙ্গীন বিকাশ লক্ষ করি তাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে এক ইংরেজি ভাষণে তিনি বলেন, There is God in history. He who created and upholds this vast universe also governs the destinies and offers of nations. The some hand which we trace in the lily and the rose, in biversp and mountains, in the movements of the planets and the surges of the sea, regulates the economy of human society, and works, unseen amid its mighty revolutions, its striking vicissitudes, and its progressive movements. History is not what superficial readers take it to be, a barren record of meaningless facts-a dry chronicle of past events, whose evanescent interest vanished with the age where they occurred, it is the most sublime revelation of God.[৪০] কেশবচন্দ্রের এ বক্তব্যে আমরা কার্লাইলের প্রভাব লক্ষ করি। কার্লাইলও ঈশ্বরকে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশময় বলে মনে করতেন। ইতিহাসকেও কার্লাইল ঈশ্বরের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : History of the world is the biography of great man.[৪১] ইতিহাসে ঈশ্বর কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেন এর উত্তরে কেশবচন্দ্র বলেছিলেন: মহান ব্যক্তি (Great man)-দের মাধ্যমেই ঈশ্বর ইতিহাসে প্রকটিত হন। কেশবচন্দ্রের এ উত্তরে কার্লাইলের উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রভাব লক্ষণীয়।

এই মহান ব্যক্তিরাই ইতিহাসের নায়ক। কার্লাইলের সুরে সুর মিলিয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও মনে করেন যে, মহান ব্যক্তিদের নেতৃত্বেই ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে মানুষ কেন্দ্রীভূত ও সংঘবদ্ধ হয়। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কালের গর্ভে অসংখ্য সমাজ এসেছে, বিকাশ লাভ করেছে, আবার ধ্বংসও হয়ে গেছে। নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে। তাদের কয়জনকে ইতিহাসে

ধরে রেখেছে? কিন্তু যাঁদের নেতৃত্বে নাম না জানা মানুষ জীবন বলি দেয়, সেই সকল মহান ব্যক্তিরা ইতিহাসে নিজেদের নাম ও স্থান ঠিকই দখল করে নেন। এসকল নেতৃস্থানীয় মহান ব্যক্তিরাই সভ্যতাকে চালনা করেন। খ্যাতি ও দ্যুতি উভয় দিক থেকেই তাঁরা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁরা নেতা, সংস্কারক ও অবতার হিসাবে পূজিত হন। অবশ্য এসকল যুগসারাথি যুগের প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতেও কার্পণ্যবোধ করেন না। যুগ-প্রয়োজনে নিজেদের ধ্যান ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাঁরা জীবন বাজি ধরেন— অন্তর্জগৎকে বহির্লোকের মধ্য দিয়ে রূপায়িত না করা পর্যন্ত আন্তরিকভাবে তাঁরা কোনো স্বস্তি পান না। গীতোক্ত বিভূতি যেমন স্বতঃই প্রকাশিত হয়, তেমনি মহান ব্যক্তিদের ধ্যানের বস্তু ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চিরন্তন জ্যোতির্ময়ের মতো ফুটে উঠে। এঁরাই হচ্ছেন ইতিহাসের মহামানব, সমাজ যাঁদের প্রয়োজন অনুভব করে দীর্ঘদিন। এ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কেশবচন্দ্র কার্লাইল ও ইমার্সনের ব্যক্তি পূজাতত্ত্বের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন : "ইমার্সন ও কার্লাইল পাঠ করেই হয়তো কেশবচন্দ্রের মনে ব্যক্তি পূজা ও অতিমানবতত্ত্ব অঙ্কুরিত হয়। তিনি মনে করতেন যে, প্রকৃতির প্রয়োজন ও তাগীদেই ঐসব মহামানবের আবির্ভাব ঘটে এবং বিশ্বনিয়ন্তার নৈতিক শক্তি তাদের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্তি লাভ করে; মহামানবদের আবির্ভাব সামাজিক প্রয়োজনেও বটে: তাঁরা শান্তি ও মুক্তির মন্ত্র প্রচার করেন। মহামানবদের জীবনে একটি সুরই কেবল অনুরণিত হয়— 'আদর্শের জন্যেই বাঁচো ও মরো'। এখানে হেগেল ও নীৎশের অনুরূপ চিন্তাও স্মতর্ব্য— যে চিন্তাকে ফ্যাসিবাদের অন্যতম প্রদান উপাদান বলে মনে করা হয়। ভারতের মাটি ও জল হাওয়ায় ব্যক্তিপূজা, অবতার তত্ত্ব, ও অতিমানবতা নতুন কিছু নয়, এবং অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই প্রতীতি গ্রহণ করেছেন। তাই ফ্যাসিবাদের পক্ষে ভারতভূমি অনুর্বর নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী কেশবচন্দ্র এই স্ববিরোধী ও সংকীর্ণ চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকলেও স্বেচ্ছাচারী শক্তিমত্তাকে অনুমোদন করতেন না।"[৪২] এভাবেই কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম ভাবনা প্রতীচ্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

প্রতিপক্ষের বক্তব্যের আলোকে কেশবচন্দ্রের ধর্মবিষয়ক মতের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। সমালোচকদের মতে, দেবেন্দ্রনাথের মতো কেশবচন্দ্রের ধর্মভাবনার অন্তরালেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় একধরনের স্বভাবজাত রক্ষণশীলতা কার্যকর ছিলো। আর একারণেই তিনি নারী প্রগতির ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। একথা ঠিক তিনি নারীজাতির অবাধ স্বাধীনতার ব্যাপারে কিছুটা রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে নারী প্রগতির বিরোধী বলে অখ্যাত করা

তাঁর প্রতি অবিচারই সূচিত করে। তিনি নারীদের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী না হলেও ব্রাহ্মসমাজের উপসনায় নারীরাও যাতে পুরুষদের সাথে সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য ব্রাহ্ম মন্দিরে তাদের স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মন্দিরের এক পাশে রেলিং দেয়া স্থানে তিনি অগ্রসর মহিলাদের বসার জায়গাও ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া নারী শিক্ষার ব্যাপারেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সুতরাং তাঁকে নারী প্রগতির বিরোধী বলা যায় না।

সমালোচকদের কেউ কেউ তাঁকে এভাবেও অভিযুক্ত করেছেন যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের গণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাশীল ছিলেন না। সমালোচকদের মতে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের যেমন একাধিকত্য ছিলো, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজেও কেশবচন্দ্র তেমনি একতান্ত্রিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন, যার ফলে ব্রাহ্মসমাজের গণতান্ত্রিক আদর্শের মর্যাদা তাঁর হাতে ভূলুণ্ঠিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, কেশবচন্দ্রই ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। তিনিই গণতান্ত্রিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজ থেকে বের হয়ে আসেন এবং ব্রাহ্মগণের প্রতিনিধি সভার প্রকাশ্য তৃতীয় অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন : "যেহেতু কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট সম্পত্তির ট্রাস্টিগণ তাঁহাদের নিজ হস্তে উক্ত সম্পত্তির কার্য্যনির্বাহভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্ম সাধারণকে তাহার শাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব এই সভার মতে ইহা একান্ত অভিলাষণীয় যে, সমাজের দাতা ও সভ্যগণ সমবেত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে যে দান প্রদত্ত হয় তাহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে ব্যয় হইবার জন্য নিয়ম এবং সভার সহব্যবস্থান স্থির করেন।"[৪৩] সুতরাং কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচকদের এই অভিযোগও খুব বেশি জোরালো বলে মনে হয় না।

কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ হলো, তিনি শেষ জীবনে নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ বলে ঘোষণা করেছিলেন। Great Men বিষয়ে এক অভিভাষণে তিনি ঘোষণা করেন : "Great men are sent by God into the world to benefit mankind. They are his apostles and missionaries, who bring to us glad tidings from heaven; and in order that they may effectualy accomplish their errand, they are endowed by him with requisite power and talents. They are created with a nature superior to that of others, which is at once the testimonial of their apostleship and the guarantee of their success. They are not made great by culture or experience: They are born great."[৪৪] এভাবেই তিনি বুদ্ধ, যীশু, মুহম্মদ (দঃ) ও চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলে আখ্যাত করেন। সমালোচকদের

মতে, কেশবচন্দ্র নিজেকেও প্রকারান্তরে একজন মহাপুরুষ বলে ঘোষণা করে বসেন। এতে ব্রাহ্মসমাজে চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করা হলো। তিনি নিজেকে মহাপুরুষ সাজিয়ে অপরাপর ব্রাহ্মণকে তাঁর অধীনে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে উপরিউক্ত উদ্ধৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কেশবচন্দ্র কোথাও নিজেকে মহাপুরুষ বলে ঘোষণা করেননি। তাঁর প্রচারকদের কেউ কেউ তাঁকে এ অভিধা দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু উক্ত উদ্ধৃতিতে তিনি কেবল মহাপুরুষদের কথাই বলেছেন, নিজেকে এ অভিধায় ভূষিত করেননি। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তাঁর বক্তব্যকে ভালো করে উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই উত্থাপিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

স্বীয় আচরণে বিরোধিতা করার জন্যও কেশবচন্দ্র সমালোচিত হয়েছেন। সমালোচকদের মতে, কেশবচন্দ্র নিজেই নিজের সৃষ্ট বিবাহবিধি লঙ্ঘন করে কোচ বিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সঙ্গে অপরিণীতা জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ দেন এবং সেই বিবাহানুষ্ঠানে পৌত্তলিক আচারানুষ্ঠান পালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বিবাহের এই ব্যাপারটা ছিলা কেশবচন্দ্রকে বিপদে ফেলার একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। কেশবচন্দ্রের জাতীয়তামুখী ব্রাহ্ম আন্দোলনকে খর্ব করার হীন উদ্দেশ্যেই ইংরেজ সরকার এই বিবাহের প্রস্তাব দেয়। দ্বিধাগ্রস্ত কিন্তু রাজভক্ত কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রসারকল্পেই সম্ভবত বিবাহদানে সম্মত হন। তাঁকে এরূপ আশ্বাসও দেয়া হয়েছিলো যে, বিবাহে কোনো পৌত্তলিকতার অনুষ্ঠান পালিত হবে না। কিন্তু ধূর্ত ইংরেজ সরকারের এই আশ্বাস ছিল নিতান্ত অন্তঃসারহীন। সেজন্য তাঁকে এ ব্যাপারে খুব একটা দায়ী করা যায় না।

এসকল সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কেশবচন্দ্রের ধর্মভাবনা তথা নববিধানের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যে আধ্যাত্মিক পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে : "আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের অবদান অসাধারণ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবাদর্শের মিলন তথা সকল ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশ্বজনীন সংস্থার পতাকাতলে প্রেম ও শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং মুমূর্ষু মানুষের মুক্তির কল্পনা নিঃসন্দেহে মৌলিক ও অনবদ্য। সকল ধর্মই তাঁর কাছে ছিলো ঐশ সত্যের প্রকাশ। প্রথমদিকে তাঁর আধ্যাত্মিক বিশ্বজনীনতার যে অস্পষ্টতা ছিল তা তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফলে কেটে যায়। সকল ধর্মের নিষ্কর্ষ— উপনিষদের একেশ্বরবাদ, ইসলামের সাম্য এবং খ্রিস্টধর্মের ঈশ্বর ও মানবের পিতা-পুত্র প্রত্যয়ের সমন্বয়ে তিনি মানুষকে একটি নতুন জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়েছিলেন। নববিধান আদর্শে তিনি কেবল সকল দর্শন ও

ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্বসমূহকেই সমন্বিত করেননি, সেগুলির ঐতিহাসিক প্রত্যয় ও প্রতীকাদিও গ্রহণ করেন। তাই কেশরচন্দ্রকে সর্ব ধর্মসমন্বয়ের ও বিশ্বজনীনতার সার্থক প্রতিভূ বলা যায়। ধর্মের মৌলচিন্তার ভিত্তিতে পরস্পর নির্ভরশীল একটি সজীব মানবিক সম্পর্ক তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বস্তুত রামমোহনের আদর্শকেই তিনি পরিবর্ধিত রূপ দিয়েছিলেন।"[৪৫] নববিধানের মাধ্যমেই তিনি তাঁর অধ্যাত্মসাধনাকে শুধু যোগের বিষয় হিসাবে না রেখে নিজের সমগ্র জীবনটিকেই একটি জীবন্ত ধর্মগ্রন্থে পরিণত করেন। এ বিষয়ে ঝরা বসুর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "প্রতিকাজে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ ও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে জীবন চালিত করে ধর্মচিন্তার নববিধান দিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ব্রাহ্ম সমাজ বিধাতার হাতের মন্ত্রস্বরূপ, 'নববিধান' ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষিত কৃপার বিধান। এই সত্যটি তিনি সকলের অন্তরে জাগ্রত করেছেন। 'ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রাহ্মানন্দ রসপান' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনা ছিলো। কিন্তু কেশবন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে নিছক জ্ঞানালোকিত দেবন্দ্র প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম রাখলেন না। তাকে ভক্তির কর্মে পরিণত করলেন। শুধু তাই নয়, সামাজিক জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার মিলন ঘটালেন। একদিকে সমাজ সংস্কার অন্যদিকে সমন্বয়ী ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উদার সর্বভারতীয় তথা সর্বজনীন মিলনের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। জাতিভেদ লোপ, নরনারীর সমান অধিকার, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতার প্রচলন, অনুন্নত জনসাধারণের উন্নয়ন, অসবর্ণ বিবাহ বিধি প্রচলন, নীতিধর্মের ভিত্তিতে জীবন গঠন ইত্যাদি সংস্কারের মধ্য দিয়ে জাতির সাংস্কৃতিক বিপ্লবও সংঘটিত হল। মানুষের সঙ্গে ভগবানের জীবন্ত সংস্পর্শ, সকল ধর্মকে আত্মস্থ করা যোগভক্তি, কর্মজ্ঞানের মিলনের নতুন বিধান দিয়েই তৈরি হল নববিধান।"[৪৬] এই হলো কেশবচন্দ্রের নববিধান। এই নববিধানই তাঁর সমন্বয়বাদী ধর্মসাধনার সুসংহত, সুসংবদ্ধ ও পরিণত রূপ।

গ্রন্থপঞ্জি ও পাদটীকা :

১। কমলা ঘোষ, **যুগস্রষ্টা কেশবচন্দ্র**, কলিকাতা, বি.সি.সিংহ ব্রাদার্স, ১৯৫৪, পৃ. ৩।

২। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, **কেশবচন্দ্রসেন**, সাহিত্য সাধক চরিতমালা -৯৭, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৫৮, পৃ. ৬।

৩। P. C Mozoomar, **The life and Teachings of keshub Chandra Sen,** Calcuilta: Baptist Mission Press, 1891 **P.55.**

৪। P. C. Mozoomdar, **Ibid,** 1891, P. 61.

৫। এখানে উল্লেখ্য যে, ওই সময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আইনশাস্ত্রে অধ্যয়ন করার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কেশবচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উভয়েই ১২৩৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৬। P. C. Mozoomdar, **The life and Teachings of Keshub Chandra Sen,** Calcutta : Baptist Mission, **1891,** P.69.

৭। কেশবচন্দ্র সেন, **জীবনবেদ,** কলিকাতা, নববিধান পাবলিশার্স, ১৮৮৩, পৃ. ৫,

৮। মনিবাগচ, **কেশবচন্দ্র সেন,** কলিকাতা, জিজ্ঞাসা পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯, পৃ. ১১।

৯। V. P. Vorma, **Modern Indian Politlical thought,** Calcutta: Dasupta and Co. 1961 P. 48.

১০। কেশবচন্দ্র ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, যদুনাথ চক্রবর্তী, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ নব্য ব্রাহ্মীরা।

১১। মনিকা মহালনবিশ (সম), **ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী,** কলিকাতা, নববিধান পাবলিশার্স, ১৯৪১, পৃ. ২৯।

১২। মনিকা মহালনবিশ সম , **ঐ,** ১৯৪১, পৃ. ৩৪,

১৩। সুবশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রক্ষমন্দিরং।

চেতঃ সুনির্মল স্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমণশ্বরং।।

বিশ্বস্পোধর্শ মূলং ছি প্রীতিঃ পরম সাধনং।

শ্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যঃ ব্রাহ্মেবেরং প্রতীর্ত্যতে।।

১৪। কেশবচন্দ্র সেন, **অধিবেশন,** কলিকাতা, ব্রাহ্মট্রাস্ট সোসাইটি, ১৯১৭, পৃ. ৪৫।

১৫। কেশবচন্দ্র সেন, **ঐ,** ১৯১৭, পৃ. ১২৯।

১৬। বিপিনচন্দ্র পালের মতে এই বিবাহের মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে কুচবিহারের রাজপুরুষেরা কেশবচন্দ্র সেনকে একটি অবাঞ্ছিত ফাঁদে ফেলে দিয়েছিলেন। সরলপ্রাণ কেশবচন্দ্র এই ফাঁদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

১৭। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, **বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা,** প্রথম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, জি. এ. ই . পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ. ৬৮।

১৮। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, ১৯৯১, পৃ. ৬৯।

১৯। কেশবচন্দ্র সেন, **অধিবেশন**, কলিকাতা, ব্রাহ্মট্রাস্ট সোসাইটি, ১৯১৭, পৃ. ১৪৪- ৪৫।

২০। কেশবচন্দ্র সেন, **সেবকের নিবেদন**, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, নববিধান পাবলিশার্স, ১৮৮১, পৃ. ৩।

২১। কেশবচন্দ্র সেন, **জীবনবেদ**, কলিকাতা : নববিধান পাবলিশার্স, ১৮৮৩, পৃ. ১১৮।

২২। কেশবচন্দ্র সেন, **আচার্যের উপদেশ**, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা : নববিধান পাবলিশার্স, ১৮৮২, পৃ. ১৮০-৮১।

২৩। Keshub Chandra Sen, **Lectures** Calcutta: Nababidhan Publishers, 1882 P. 56.

২৪। যদা যদাহি ধর্মস্ব গ্লানি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধম্মষ্ক্য তদাত্মানং মৃজাম্যহম্ ।।
পরিত্রাণড় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম সংসুপানার্থায় সম্ভামি সুগে যুগে।।

২৫। ঝরা বসু, **উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র**, কলিকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলির্শার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০, পৃ. ৩৩-৩৪।

২৬। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, **বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা**। প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, জি. এ. ই, পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ. ৭১।

২৭। কেশবচন্দ্র সেন, **সেবকের নিবেদন**, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, নববিধান পাবলিশার্স, ১৮৮১, পৃ. ৭।

২৮। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, **আরতি**, পৃ. ৪৬।

২৯। কেশবচন্দ্র সেন, **সেবকের নিবেদন**, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, নববিধান পাবলিশার্স, ১৮৮১, পৃ. ২২৭।

৩০। কেশবচন্দ্র সেন, **ঐ**, ১৮৮১, পৃ. ১৯০।

৩১। কেশবচন্দ্র সেন, **ঐ**, ১৮৮১, পৃ. ১৯৩।

৩২। গৌরগোবিন্দ রায়, **আচার্য কেশবচন্দ্র**, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৪, পৃ. ১০২৬।

৩৩। কেশবচন্দ্র সেন, **জীবনবেদ**, কলিকাতা, নববিধান পাবলিশার্স, ১৮৮৩, পৃ. ২-৩, ।

৩৪। এ ব্যাপারে ফরাসী দার্শনিক হেনরি বার্গসোঁর চিন্তাধারার পূর্বাভাস আমরা কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে লক্ষ করি।

৩৫। কেশবচন্দ্র সেন, **পত্রাবলী**, কলিকাতা, ১৯৪১, পৃ. ২৩৩।

৩৬। কেশবচন্দ্র সেন, **ঐ**, ১৯৪১, পৃ. ২৩৪।

৩৭। এখানে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধনমার্গ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের চিন্তাধারার পার্থক্য লক্ষণীয়। দেবেন্দ্রনাথ ধর্মকে লাভ করেছিলেন নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ থেকে। আর কেশবচন্দ্র ধর্মকে লাভ করলেন প্রার্থনার মাধ্যমে। তবে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিলো এটুকু যে, উভয়েরই ধর্মজীবন শুরু হয়েছিলো ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসার অনেক পূর্ব থেকেই।

৩৮। ঝরা বসু, **উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র**, কলিকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০, পৃ. ৩৯।

৩৯। আচার্য যদুনাথ সরকার, **অভিভাষণ**, যুগান্তর, ১৯৫৩, ২৫ নভেম্বর।

৪০। Keshub Chandra Sen, **Sen in Englard** , Part II . P. 56.

৪১। উদ্ধৃত: সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, **বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা**, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ. ৭৩।

৪২। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঐ, ১৯৯১, পৃ. ৮৩-৮৪।

৪৩। কেশবচন্দ্র সেন, **অধিবেশন : কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ**, কলিকাতা, ব্রাহ্ম ট্রাস্ট সোসাইটি, ১৯১৭, পৃ. ২১।

৪৪। Keshub Chandra Sen, **Lectures in Engard,** Cakcutta, 1954, P. 46.

৪৫। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপ্রাধ্যায়, **বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা**, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ. ৮৩।

৪৬। ঝরাবসু, **উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র**, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০, পৃ. ৪৮।